রাহে বেলায়াত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় - বেলায়াত ও যিকর

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

জ. মাসনূন যিকরের শ্রেণীবিভাগ - ৭. দু‘আ বা প্রার্থনা বিষয়ক বাক্যাদি - (খ) দু‘আর সুন্নাত-সম্মত নিয়ম ও আদব - পঞ্চম ভাগ

১৩. দু‘আর শুরুতে ও শেষে সালাত পাঠ

দু‘আর অন্যতম আদব ও দু‘আ কবুলের অন্যতম ওসীলা দু‘আর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর উপর সালাত বা দরুদ পাঠ করা। আমরা এ বিষয়ে কিছু পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

১৪. দু‘আয় ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলা

যিকর নং ২৩ : (يا ذا الجلال والإكرام)

আল্লাহর নাম নিয়ে দু‘আর ক্ষেত্রে বিশেষ একটি নাম ‘যুল জালালি ওয়াল ইকরাম’। দু‘আর মধ্যে এই নাম বেশি বেশি বলতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন। রাবীয়া ইবনু আমের (রাঃ) বলেন , রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

ألظوا بـيا ذا الجلال والإكرام

“তোমরা ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’-কে [অর্থ: হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী] সর্বদা আঁকড়ে ধরে থাকবে (দু‘আয় বেশি বেশি বলবে)”।[1]

১৫. মুনাজাত শেষে নির্দিষ্ট বাক্য সর্বদা বলা

এই হাদীস থেকে দু‘আর মধ্যে বা শেষে ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলার ফযীলত জানতে পারছি। এছাড়া সালাতের পরে মুনাজাতের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরয সালাতের সালাম ফেরানোর পরে ‘আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ... যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলতেন। এজন্য অনেকে সর্বদা দু‘আ বা মুনাজাতের শেষে ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলেন।

এই বাক্যটি দ্বারা দু‘আ বা মুনাজাত শেষ করা ভালো ও ফযীলতের কাজ। তবে ‘আল্লহুম্মা আনতাস সালাম ... ’ ছাড়া অন্য সকল দু‘আ ও মুনাজাতের শেষে সর্বদা উক্ত বাক্যটি বলা উচিৎ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা এই বাক্য দিয়ে দু‘আ শেষ করতেন না। সুন্নাতের নির্দেশ ছাড়া কোনো কিছুকে সর্বদা

করণীয়-রীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

অনেকে সর্বদা ‘আল-হামদু লিল্লাহি রাবিবল আ'লামীন’ বলে দু‘আ শেষ করেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ সর্বোত্তম দু‘আ। এছাড়া কুরআন করীমে জান্নাতের অধিবাসীগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদের শেষ দু‘আ ‘আল-হামদু লিল্লাহ’। এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে দু‘আর মধ্যে ও শেষে ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বা ‘আল-হামদু লিল্লাহি রাবিবল আ'লামীন’ - বলা ভালো ও ফযীলতের। তবে সর্বদা বলা উচিত নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ সর্বদা এভাবে সকল দু‘আ বা মুনাজাত এই বাক্য দ্বারা শেষ করেননি।

আমরা “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে আলোচনা করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যা অধিকাংশ সময় করেছেন তাও সবসময় করতে নিষেধ করেছেন ইমাম আবু হানীফাসহ সাহাবী-তাবেয়ী যুগের ইমাম ও ফকীহগণ (রহঃ)। কারণ, এতে খেলাফে সুন্নাত হবে এবং মাঝে মাঝে যা করেছেন সেই সুন্নাত বাদ দেওয়া হবে।

এজন্য আমাদের উচিত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসনূন বাক্য, দু‘আ ও মুনাজাত ব্যবহার করে দু‘আ করা।

কালেমা তাইয়্যেবা দ্বারা দু‘আ শেষ করা আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রচলিত অভ্যাস দু‘আর শেষে কালেমাহ তাইয়্যেবাহ “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বলে দু‘আ বা মুনাজাত শেষ করা। আমার জানা মতে দু‘আর শেষে এই কালেমাহ পাঠের কোনো ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) বা তাঁর সাহাবীগণের শিক্ষা বা কর্মের মধ্যে অর্থাৎ সুন্নাতে নববী বা সুন্নাতে সাহাবার মধ্যে নেই। কালেমাহ তাইয়্যেবাহ আমাদের ঈমানের ভিত্তি। “লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু” সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর। দু‘আ বা মুনাজাতের শেষে বা অন্য কোনো সময়ে এগুলি পাঠ করা কখনই না-জায়েয নয়। কিন্তু সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে রীতি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

কখন কোন্ কালেমা, যিকর ও দু‘আ পড়তে হবে তারও সুন্নাত রয়েছে। সাধারণ ফযীলত বিষয়ক হাদীসের উপর ভিত্তি করে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা রীতি তৈরি করলে তা সুন্নাত পরিত্যাগ বা সুন্নাত অবহেলা করার মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে আমি “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এখানে শুধু দু‘আর বিষয়টি দেখি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ আজীবন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সর্বদা দু‘আ ও মুনাজাত করেছেন। তাঁদের প্রার্থনা, দু‘আ বা মুনাজাতের সকল খুঁটিনাটি শব্দ, বাক্য, সময়, অবস্থা ইত্যাদি আমরা জানতে পারছি। আমরা দেখছি যে, তাঁরা নিয়মিত তো দূরের কথা কখনো ‘কালেমাহ তাইয়্যেবা’ দিয়ে মুনাজাত শেষ করেননি। এর ফযীলতেও কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। ‘কালেমাহ তাইয়্যেবা’-র ফযীলত তাঁদের চেয়ে বেশি কেউ জানত না। মুনাজাতের গুরুত্বও তাঁদের চেয়ে কেউ বেশি দেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা এভাবে মুনাজাত করেননি। আমাদের উচিত তাঁদের সুন্নাতের মধ্যে থাকা। তাঁদের সুন্নাতই আমাদের নিরাপত্তার উৎস ও সকল কামালাতের একমাত্র পথ।

আমার মনে হয়েছে আদম (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা আমাদের এই রীতির কারণ। একটি অত্যন্ত যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, “ আদম (আ.) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করে ভুল করে ফেলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেনঃ হে প্রভু, আমি মুহাম্মাদের হক্ক (অধিকার) দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি

যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ বলেনঃ হে আদম, তুমি কিভাবে মুহাম্মাদকে (সা.) চিনলে, আমি তো এখনো তাঁকে সৃষ্টিই করিনি? তিনি বলেনঃ হে প্রভু, আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেন এবং আমার মধ্যে আপনার রুহ (আত্মা) ফুঁ দিয়ে প্রবেশ করান, তখন আমি মাথা তুলে দেখলাম আরশের খুঁটিসমূহের উপর লিখা রয়েছেঃ ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’। এতে আমি জানতে পারলাম যে, আপনার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি বলেই আপনি আপনার নামের সাথে তাঁর নামকে সংযুক্ত করেছেন। তখন আল্লাহ বলেনঃ হে আদম, তুমি ঠিকই বলেছ। তিনিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তুমি আমার কাছে তাঁর হক্ক (অধিকার) দিয়ে চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মুহাম্মাদ (সা.) না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।”

হাকিম নাইসাপূরী হাদীসটি সংকলন করে একে সহীহ বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস একমত যে হাদীসটি যয়ীফ। তবে মাউযূ কিনা তাতে তারা মতভেদ করেছেন।[2] হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমি ‘হাদীসের নামে জালিয়াতি’ নামক গ্রন্থে।[3] এখানে লক্ষণীয় যে, হাদীসটিতে ‘কালেমা তাইয়্যেবা’ দ্বারা মুনাজাত শেষ করার বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা নেই। আমাদের উচিত মাসনূন, মাশহুর হাদীসগুলির উপর নির্ভর করা। সুন্নাতের বাইরে কোনো কিছুকে রীতি বা নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা কখনোই উচিত নয়।

তাবিয়ী আ’মাশ (১৪৮ হি) বলেন, প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবরাহীম নাখ’য়ীকে (৯৬হি) জিজ্ঞাসা করা হলো, ইমাম যদি সালাতের সালাম ফেরানোর পরে বলেঃ (صلى الله على محمد لا إله إلا الله) “আল্লাহর সালাত মুহাম্মাদের উপর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই।” তবে তার বিধান কি? তিনি বলেনঃ (ما كان من قبلهم يصنع هكذا) “এদের আগে যারা চলে গেছেন তাঁরা (নবী (সা.) ও সাহাবীগণ) এভাবে বলতেন না।”[4]

সুবহানাল্লাহ! মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠতম দুটি যিকর - ‘লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’ ও সালাত পাঠ। এই দুটি যিকরের ফযীলতের বিষয়ে ইবরাহীম নাখ’য়ী ও সকল তাবেয়ী একমত। কিন্তু সালতের সালামের পরে তা বলতে তাদের আপত্তি। কারণ সুন্নাতের বাইরে কোনো রীতি বা কাজে তাঁদের আগ্রহ ছিল না। তাঁদের একমাত্র আদর্শ রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ। যেহেতু তাঁরা সালামের পরে এই যিকর দুটি এভাবে বলতেন না এজন্য তিনি এতে আপত্তি করেছেন।

১৬. দু‘আ কবুলের অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা

যে সকল অবস্থায় দু‘আ করলে আল্লাহ কবুল করবেন বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে সে সকল অবস্থায় বেশি বেশি দু‘আ করা উচিত। যেমন,- সফর অবস্থায় দু‘আ, হজ্ব পালন অবস্থায় দু‘আ, সিয়াম অবস্থায় দু‘আ, ইফতারের সময়ের দু‘আ। ন্যায়পরায়ণ প্রশাসক বা শাসক, মাজলুম, মুসাফির, সায়িম, পিতা-মাতা, প্রমুখের দু‘আ কবুল হবে বলে বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।[5]

১৭. বারবার চাওয়া বা তিনবার চাওয়া

দু‘আর একটি মাসনূন আদব আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইলে অনেকটা নাছোড়বান্দা করুণাপ্রার্থীর মতোই একই সময়ে বারবার চাওয়া, বিশেষত তিনবার চাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ (রাঃ) বলেনঃ

ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلاثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاثًا

“রাসূলুল্লাহ (সা.) খুবই পছন্দ করতেন যে, তিনি দু‘আ করলে তিনবার করবেন, ইস্তিগফার করলে তিনবার করবেন।” হাদীসটি সহীহ।[6]

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’ঊদ বলেনঃ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلاثًا وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاثًا

“নবীয়ে আকরাম (সা.) যখন দু‘আ করতেন তখন তিনবার দু‘আ করতেন এবং তিনি যখন চাইতেন বা প্রার্থনা করতেন তখন ৩ বার করতেন।”[7]

১৮. দু‘আর সময় কিবলামুখী হওয়া

মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে পারেন এবং আল্লাহর দরবারে তার আরজি পেশ করতে পারেন। ওযু বা ওযুহীন অবস্থায়, যে কোনো দিকে মুখ করে বা দাঁড়ানো, বসা বা শোয়া যে কোনো অবস্থায় মুমিন যিকর ও দু‘আ করতে পারেন। তবে কিবলার দিকে মুখ করে দোওয়া করা উত্তম, বিশেষত যখন বিশেষভাবে আগ্রহ সহকারে দু‘আ করা হয়। হাদীস শরীফে কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে দু‘আর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কিবলামুখী হয়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বৃষ্টির জন্য দু‘আর সময়, যুদ্ধের ময়দানের আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু‘আর সময়, আরাফা, মুযাদালিফা ও অন্যান্য স্থানে দু‘আর সময়, বিশেষ আবেগ ও বেদনার সময়, কখনো কখনো কোনো কোনো সাহাবীর জন্য দু‘আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্য অবস্থা থেকে ঘুরে বিশেষভাবে কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।[8]

এছাড়া সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বসার জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ

إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة

“প্রত্যেক বিষয়ের সাইয়্যেদ বা নেতা আছে। বসার নেতা কিবলামুখী হয়ে বসা।” হাদীসটির সনদ হাসান।[9]

এ সকল হাদীসের আলোকে যাকিরের জন্য সম্ভব হলে যিকর ও দু‘আর জন্য কিবলামুখী হওয়া উত্তম। আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতি নিয়ে মনকে একাগ্র করে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দু‘আ করা উত্তম। তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, যে কোনো ফযীলতের হাদীস পালনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ কিভাবে পালন করেছেন তাঁর আলোকে পালন করতে হবে। ফযীলতের হাদীসের উপর ভিত্তি করে নিজেদের মনোমতো আমল করলে বা রীতি তৈরি করে নিলে কিভাবে নিন্দনীয় বিদ’আতে নিপতিত হতে হয় তার অনেক উদাহরণ আমি “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

দু‘আর অন্যান্য আদব ও কিবলামুখী হয়ে দু‘আর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করা উত্তম হলেও রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বদা দু‘আর সময় কিবলামুখী হতেন না। অনেক সময় যে অবস্থায় রয়েছেন ঐ অবস্থায় দু‘আ করতেন। অনেক সময় তিনি ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দু‘আ করেছেন। এথেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারিঃ প্রথমত, যে সকল দু‘আর ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করেছেন, সে সময় কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করা সুন্নাত। দ্বিতীয়ত, যে সময় ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে ঘুরে দু‘আ করেছেন, সে সময়ে ঘুরে দু‘আ সুন্নাত। অন্য সময়ে কিবলামুখী হওয়া উত্তম, কিন্তু মুস্তাহাব পর্যায়ের উত্তম।

এজন্য এ সকল সাধারণ ক্ষেত্রে একে বেশি গুরুত্ব দিলে, না করলে কিছুটা অন্যায় হবে বা খারাপ হবে মনে করলে বা সর্বদা পালনীয় রীতিতে পরিণত করলে তা বিদ‘আতে পরিণত হবে। “এহ্ইয়াউস সুনান” গ্রন্থে আমরা এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যে কাজ মাঝে মাঝে করতেন তা মুস্তাহাব হলেও নিয়মিত রীতিতে পরিণত করতে ইমামগণ নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলা থেকে ঘুরে বা কিবলার দিকে পিছন ফিরে যিকর ও দু‘আ করতেন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) সালাম ফেরানেরা পরে ইমামের কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বা দু‘আ করা ‘মাকরূহ’ বা অপছন্দনীয় বলেছেন।[10] হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা সারাখসী লিখেছেন: যদিও কিবলামুখী হয়ে বসা শ্রেষ্ঠতম বসা বা সকল বৈঠকের নেতা, কিন্তু সালাতের সালাম ফেরনোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসা ইমামের জন্য মাকরূহ, কারণ সাহাবী-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের জন্য সালাতের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বিদ‘আত।[11]

ফুটনোট

[1] হাদিসটি সহীহ। মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৬, মুসনাদ আবী ইয়ালা ৬/৪৪৫, সুনানুত তিরমিযী (আনাস থেকে) ৫/৫৩৯-৫৪০, (নং ৩৫২৪, ৩৫২৫), তুহফাতুল আহওয়াযী ৯/৩৫৯, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/২৬৯, নং ১২৫০, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৪/৪৯-৫১।

[2] তাবারানী, আল-মু’জামুস সাগীর ২/১৮২, নং ৯৯২, মুসতাদরাক হাকিম ২/৬৭২, তারিখ ইবনু কাসীর ২/৩২৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২৫৩, সিলসিলাতুয যয়ীফাহ ১/৮৮-৮৯, নং ২৫।

[3] হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ২৪৮-২৫০।

[4] মুসান্নাফ ইবনি আবী শাইবা ১/২৭০।

[5] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৫১-১৫৩।

[6] সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২০৩, মুসনাদ আহমাদ ১/৩৯৪, ৩৯৭, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৫১-৫২।

[7] সহীহ মুসলিম ৩/১৪১৮, নং ১৭৯৪।

[8] এ বিষয়ক কিছু হাদীস দেখুনঃ সহীহ মুসলিম ২/৬১১, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৫৭১, মুসনাদ আবী উওয়ানা ১/৪/২২০, ২৮৭-২৮৮, বাইহাকী আস-সুনানুল কুবরা ২/৩৮৯, সুনানুন নাসাঈ ৫/২১৩, মুসান্নাফ ইবনি আবী শাইবা ৬/৪৯, মুসনাদ আহমাদ ১/৩০, ৩২, ২/২৩৪।

[9] তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত ৩/২৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৫৯।

[10] ইমাম মুহাম্মাদ, আল-মাবসূত ১১১৭-১৮।

[11] সারাখসী, আল-মাবসূত ১/৩৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=8747

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন